



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.63-69

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় গৌতমবুদ্ধ প্রসঙ্গ

দেবাশিষ মেটে

স্নাতকোত্তরের ছাত্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The ancient literature of every language is based on religion, and Bengali literature is no exception. It is widely accepted that literature flourished in ancient times, especially in the Middle Ages. Although enlightened in the light of the renaissance, some of the authors of Bengali literature could not banish religion from the content of literature. That is why they have presented religion in a modern way through their writings. Along with Hindu deities, he also made Buddhism a subject of literature. Where the Hindu goddess used violence as a tool to propagate greatness, the path of sadhana in the development of Buddhist self-power has been matched in the society as the cause of Nirvana. Buddha was not a god or an incarnation of God. Despite being a prince, he was an ordinary man and through his own efforts he knew the ultimate truth of life. Buddha was not a savior of the human race. He would rather inspire his followers to be self-reliant and to work diligently for their own salvation. His point was to try yourself. It was in this ideology of the Buddha that many Bengali scholars devoted themselves to the salvation of the lost glory of Buddhism. He called upon the Bengali writers to awaken the masses to self-empowerment through their prolific write, poet.

আত্মজাগরণের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। এই জাগরণের ফলেই বাঙালি দৈবনির্ভরতা ত্যাগ করে সক্রিয় শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই উদ্বোধনের সহায়ক হয়েছে বুদ্ধের আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠায় অনমনীয় দৃঢ়তা। দৈবকে উপেক্ষা করে মানুষ কিভাবে নিজস্ব কর্ম প্রবণতায় জাগতিক মোহ বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ কিভাবে পরম আনন্দ লাভ করতে পারে তার পথপ্রদর্শন ছিলেন বুদ্ধদেব। পরম দীপ্তিমান পুরুষ সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন^১। ভারতবর্ষে যখন ষোলটি স্বাধীন খন্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ষোলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে ষোড়শ মহাজনপদ নামে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভারতে ধর্ম সাধনায় এক বিপ্লব দেখা দেয়। বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যখন ভারতভূমি পশুর রক্তে প্লাবিত তখন দেশের চিন্তাশীল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ উপলব্ধি করলেন এই বৈদিক কাণ্ড মানুষকে সাময়িক সুখ দিলেও স্থায়ী সুখ প্রদানে অসমর্থ। তাই তারা এই পথ পরিত্যাগ করে

সাধনপথে পরমপুরুষার্থ লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন। আত্মশক্তির বিকাশের জন্য বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের হারানো ঐশ্বর্যের উদ্ধারের জন্য অনেক বাঙালি মনীষী আত্মনিয়োগ করে ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ সাধ্যসাধন তত্ত্বের এক সাধন সংগীত চর্যাপদে নাট্যাভিনয়ের সংকেত পাওয়া গেলেও প্রকৃত নাটক বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে সৃষ্টি হয়নি। পৌরাণিক ও সামাজিক ভাবধারার নাটক যখন শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জনের সামগ্রী, ঠিক সেই সময় বৈচিত্রের চাহিদায় নাট্য সাহিত্যের আঙিনায় বৌদ্ধ সাহিত্য ধর্মান্বলম্বী নাটক রচনায় বাঙালি রচনাকার মনোনিবেশ করেন। এই ধারার একজন সার্থক নাট্যকার হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর ‘বুদ্ধদেব চরিত’^২ (১৮৮৭) বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় জীবন নাট্যের স্থান অধিকার করে আছে। সিদ্ধার্থ চরিত্র দ্বারা বুদ্ধদেবের চারিত্রিক অলৌকিক মহিমা, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও মানবীয় অনুভূতির সংযোগ সাধন দেখতে পাওয়া যায় আলোচ্য নাটকে। এডউইন আর্নল্ড এর কাব্য ‘The Light of Asia’ অবলম্বনে এই নাট্য রচনা করেছেন নাট্যকার এবং উৎসর্গ করেন তাঁকেই। দর্শক দিগকে আকৃষ্ট করার মতো নাট্য রস এই নাটকে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই সুকুমার সেন বলেছেন-

“নাটকের গোড়াতেই বুদ্ধের অবতারত্ব ধরিয়া লওয়ায় নাট্যরস জমিতে পারে নাই।”

আলোচ্য নাটকটি ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। নাটকটি পর্যালোচনা করে বলা যায় নাটকের ভাষাশৈলী ও যতি চিহ্নের ব্যবহার বেশ নিপুন নাট্যকারের পূর্ব রচনার তুলনায়। গিরিশচন্দ্রের এই নাট্য রচনাকে অনুসরণ করে পরবর্তী অনেক নাট্যকার বৌদ্ধ সাহিত্যাবলম্বী নাট্য রচনা করতে চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষীরোদপ্রসাদ, মন্মথ রায় প্রমুখ।

প্রধানত প্রখ্যাত নট-নাট্যকার গিরিশ ঘোষের ধারা বেয়েই বাংলা নাট্য সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের আবির্ভাব। প্রথম দিকে তিনি ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের যে নাট্য বোধ ছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তার অধিকারী ছিলেন না বলেই খুব সার্থক পৌরাণিক নাটক রচনা করে উঠতে পারেননি। তার দৃষ্টি ছিল মূলত জনমনোরঞ্জনের দিকেই। এছাড়া তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে পুরাণকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভক্তিরস জমাতে পারেন নি। তাই সংখ্যা বাহুল্যে তিনি সর্বকালের বাংলা নাটক রচয়িতাদের মধ্যে একজন অন্যতম অগ্রণী পুরুষ হলেও সাহিত্য গুণে তার অধিকাংশ নাটকই নির্দিষ্ট মান স্পর্শ করতে পারেনি। তার রচনা সম্ভারে দুটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ যুগের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটক হলো ‘অশোক’^৩ (১৩১৩) ও ‘বিদূরথ’^৪ (১৩২৯)। প্রথম নাটকে সিদ্ধার্থ গৌতমের বাণী প্রচারের ভূমিকায় কৃপানন্দের অবতারণা করেছেন নাট্যকার। আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা কৃপানন্দ ও তার শিষ্য শার্ঙ্গধরকে দেখতে পায়। কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গধরের উক্তি ও প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব প্রসঙ্গ চলে আসে-

“তুমি ভগবান বুদ্ধদেবের বিশাল করুণার অংশভাগী। বৎস! সাধনায় তুমিও হৃদয়কে করুণার প্রস্রবণ করেছ। তোমার প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়েছে তখন সে শক্তিমান এসেছে। কিন্তু কর্ম বিপাকে সে এখনও আপনাকে চিনতে পারছে না। যেদিন চিনবে- নিজে সে যেদিন সেই বৃক্ষের সন্ধান পাবে, সেদিন জীবের করুণা পেতে আর বিলম্ব হবে না।”

কৃপানন্দের উক্তির মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রভাব অশোকের রাজত্বকালে ছিলো তা আমরা জানতে পারি। এই নাটকে অশোকের ইতিহাস মর্যাদা রক্ষিত হয় নি ঠিকই কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনায় কিছু কর্মকুশলতা দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় নাটকে উৎস হিসাবে বুদ্ধের উপাখ্যানে নাগপতি কন্যা চিত্রা ও বিদূরথের কাহিনী পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই উপাখ্যানের ঐতিহাসিক অংশের উপর ভিত্তি করে এই নাটক রচনা করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এই নাটকে বুদ্ধের অবতারণা ভিক্ষুক হয়ে যাওয়ার পর। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য আনন্দে কে দেখতে পায়। বুদ্ধের পিতা যে শুদ্ধোদন সে কথা শিষ্য আনন্দের কাছে শুনে বুদ্ধ প্রতিবাদ করেছে -

“রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতা বুদ্ধের নয়।”

নাট্যকার মায়ার আলোকে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব স্মৃতিচারণ করেছেন বুদ্ধের যবনিকার মধ্য দিয়েই।

আধুনিক একাঙ্ক নাটকের শ্রেষ্ঠ মন্থথ রায় বাংলা নাট্য সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার প্রথম একাঙ্ক নাটক ‘মুক্তির ডাক’ বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকের প্রকাশকালে নাট্যকার নিবন্ধে লিখেছিলেন-

“মুক্তির ডাক ইতিহাসের নিতান্ত অস্পষ্ট ছায়াপথ হইলেও ইহাকে এক কাল্পনিক চিত্র রূপে গ্রহণ করিলে ঐতিহাসিকগণও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিবেন এবং আমিও বাঁচিয়া যাইব।” তার এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় উক্ত নাটকটি ইতিহাসাশ্রিত নাটক। এই নাটকে নগর নটি অম্বার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে সুন্দরক নামক এক যুবক তাঁকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এবং দর্শনী বাবদ দশ সহস্র মুদ্রা স্ত্রীর কাছে দাবি করে। অম্বার উপস্থিতিতে স্ত্রী পদ্মা মুদ্রা না দেওয়াই তাঁর বাড়িটি অম্বাকে দান করে দেয়। এমন সময় অম্বার প্রণয়ী নৃপতি বিশ্বিসার প্রবেশ করে। সকল বিষয়ে অবগত হয়ে তিনি একটি মর্মান্তিক সত্য উৎঘাটন করেন যে পদ্মা, বিশ্বিসার ও অম্বার অবৈধ সন্তান। পদ্মার জন্মের কিছুদিন পর অম্বা পদ্মা কে তার আগের স্বামী সুচিত্রের বাড়িতে রেখে বিশ্বিসারের সাথে পালিয়ে যায়। সুচিত্র পদ্মাকে মানুষ করে সুন্দরকের সাথে বিবাহ দিয়ে গৃহত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। সুচিত্রার উপস্থিতিতে অম্বা অনুতপ্ত হয় এবং বুঝতে পারে পদ্মা তারই কন্যা, যাকে তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন তার স্বামী সুন্দরকের দ্বারা। কিন্তু সুন্দরক পদ্মা কে হত্যা করেনি, পদ্মার জীবিত সংবাদ ও তাকে প্রত্যক্ষ দেখে মনন পীড়ায় জর্জরিত হয়ে পূর্বস্বামী সুচিত্রের ন্যায় বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত জ্বালা জুড়াবার জন্য বেণুবনে ছুটে যান। শ্রী বুদ্ধ তাঁকে আশীর্বাদ করেন, এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

কাব্য কবিতায় বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বেশ কয়েকটি লেখক এর রচনার মধ্যে পেয়ে থাকি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তার ‘স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটিতে পালি বা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মূল কাহিনীর ওপর নির্ভর না করে নিজের মনঃপুত চিন্তাধারায় বুদ্ধদেবের আদর্শকে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করেছেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু হিসেবে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের কারণ গুলিকে চারটি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। স্বপ্নের প্রথম চিত্র হল আশি বছরের বৃদ্ধ। দ্বিতীয় চিত্র মরুভূমির মধ্যে স্বজন পরিত্যক্ত বিকারগ্রস্থ যুবাপুরুষ। তৃতীয় চিত্র জাহ্নবী পুলিনে মৃত ষোড়শী সুন্দরী, এবং চতুর্থ চিত্রটি হল হিমালয়ের নির্জন শিখরে অবস্থিত এক প্রশান্ত মূর্তি তাপসের। মূল কাহিনীর উপজীব্য জরাজীর্ণ, ব্যাধিগ্রস্থ মৃত্যু চিত্রকে লক্ষ্য করে লেখক তার কল্পনাকে

বিস্তার করেছেন। এই সমস্ত দৃশ্যগুলিই সিদ্ধার্থের অন্তরকে বৈরাগ্য পূর্ণ করে তুলেছিল। তার ত্যাগের সংকল্প হল -

“ চাহিনা হইতে রাজ অধিরাজ
বড়ে মহীরহ ত্যাগেই পড়ে
বিভব বাসনা নাহি রাখে চিতে
মনির কারণে ফণিনী মরে। ”(স্বপ্নভঙ্গ)

করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধের ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি বেশকিছু কবিতায় বৌদ্ধ ধর্মের অবতারণা করেছেন যেমন ‘অমিতাভ’ কবিতায় বুদ্ধের কঠোর সাধনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বুদ্ধের চরণে। ‘কুনালকাঞ্চন’ কবিতায় মৈত্রী ও করুণা সমাশ্রয়ী কুনালের চরিত্র এবং সর্বজীবে সেবাপরায়ণ পতিগতপ্রানা কাঞ্চন মালার চরিত্র অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছিলেন।

বুদ্ধ প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই মৈত্রীর বিকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু এই কঠোর ব্রত ভারতবর্ষ বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি। অহিংসা কে ত্যাগ করে মানুষ হিংস্র হয়ে উঠেছে। শান্তি ও কল্যাণের পূজারী কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বৌদ্ধ কৃষ্টি বিপর্যয়ের নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন। সভ্যতা নামধারী বর্বরতা কে তিনি খিৎকার দিয়ে বলেছেন-

“অমৃতের চেয়ে গড়লে ধরার স্বাভাবিক অভিরুচি।”

রবীন্দ্রনাথও বিভিন্নভাবে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহে ছিল বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা। তাঁর ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সম্ভ্রাত’ (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘বৌদ্ধধর্ম’ (১৯০১) গ্রন্থদুটিই তার প্রমাণ বহন করে। এছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘The Sanskrit Buddhist Literature Of Nepal’ গ্রন্থটি তাঁকে অনেক বৌদ্ধআখ্যানের সন্ধান দেয়। এই গ্রন্থ থেকে কবি যে সকল আখ্যান তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে ব্যবহার করেছেন তা হলো শ্রেষ্ঠভিক্ষা, পূজারিণী, নগরলক্ষ্মী, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, ও অভিসার ইত্যাদি। ‘কথা ও কাহিনী’ কবিতাগ্রন্থের সকল আখ্যানই তিনি গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ কাহিনী থেকে।

‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’ কবিতায় কবি মূল বৌদ্ধ কাহিনীকে প্রায় যথাযথ অনুসরণ করেছেন। প্রভু বুদ্ধের নামে ভিক্ষাপ্রার্থী অনাথপিণ্ড শাবস্তীপুরীর ‘গগনলগন’ প্রাসাদ শ্রেণী অতিক্রম করে চলেছেন। ধ্বনি পুরবাসির দেওয়া মুঠি মুঠি রত্নমানিক্যর প্রতি তার ভ্রক্ষেপ নেই। পৌরজনের কাছে তার আবেদন-

“ওগো পৌরজন করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,
দেহো তারে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান যতোনো।”

অবশেষে মহানগরীর সীমা পার হয়ে বনের প্রান্তে এসে দীন নারীর ছিন্ন বসনকে তিনি শ্রেষ্ঠ দান হিসেবে মাথায় তুলে নিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে ত্যাগের আদর্শকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে।

‘পূজারিণী’ কবিতাটি ‘নটীর পূজা’ নাটিকার পূর্বতন রূপ। ‘পূজারিণী’ কবিতা ও ‘নটীর পূজা’ নাটিকার রচনাকাল এর ব্যবধান দেখলে বোঝা যায় এই বুদ্ধকাহিনীর প্রতি কবির কত গভীর অনুরাগ ছিল এবং কত দীর্ঘ দিন ধরে কবির মনকে অধিকার করে ছিল। এই কবিতায় বুদ্ধের বেদিমূলে শ্রীমতীর আত্মদান একটা সাধারণ ত্যাগের কাহিনীরূপে বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে ‘নটীর পূজা’য় তার নিগূঢ় অর্থে ও তাৎপর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

‘নগরলক্ষ্মী’ কবিতায় দেখা যায় সমৃদ্ধ শ্রাবস্তী নগরী প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। ভগবান বুদ্ধ ক্ষুধিতদের অন্নদানের জন্য প্রত্যেক পুরবাসীর কাছে জনে জনে আবেদন জানানেন। ধনী-মানী যাঁরা ছিলেন সকলেই ক্ষুধার্ত বিশাল পুরীর ক্ষুধা মেটাবার ব্যাপারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে নীরবে মাথানত করলেন। এই বিষয়টি কবির অপূর্ব সৃষ্টি কুশলতায় এক অসাধারণ চিত্র রূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে-

“নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-’পরে

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি

সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।”

বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে করলেও কবিপ্রতিভার স্পর্শে ‘নগরলক্ষ্মী’ কবিতাটি অনেকাংশে মৌলিক সৃষ্টির তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

‘পরিশোধ’ কবিতায় মূল কাহিনীর অনেকাংশই কবি বর্জন করেছেন। দর্শনমাত্র বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার চিন্তে প্রণয়সঞ্চারণ, সেই প্রণয়কে চরিতার্থ করার জন্য অপর এক প্রণয়ীর প্রাণসংহার এবং শ্যামার কবল থেকে বজ্রাসনের আত্ম পরিত্রান- রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পরিশোধ’ কবিতায় মূল কাহিনী থেকে এই কয়টি অংশই মুখ্যভাবে গ্রহণ করেছেন।

‘কথা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সামান্য ক্ষতি’ কবিতার মূল উৎস ‘দিব্যাবদানমালা’-র অন্তর্গত শ্যামাবতীর কাহিনী। মূল বৌদ্ধ কাহিনীর কাঠামো টুকু শুধু কবি গ্রহণ করেছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে এক নাটকীয় আভাসের মধ্য দিয়ে-

“বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,

স্বচ্ছসলিলা বরণা।

পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে

শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,

স্নানে চলেছেন শতসখী সনে

কাশির মহিষী করুণা।”

বৌদ্ধ কাহিনীর শ্যামাবতী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মহিষী করুণায় রূপান্তরিত হয়েছেন। তার এক প্রহরের লীলায় দরিদ্র প্রজাদের কুটিরগুলি লেলিহান অগ্নিশিখায় নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৌদ্ধ কাহিনীতে শুধুমাত্র সাধুর কুটিরটি ভস্মভূত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দরিদ্র প্রজাদের ছোট গ্রাম খানি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রানীর এই নির্মম কার্যের বিচারে কাশীরাজ তাকে ভিখারিনীর বেশ পরিয়ে আদেশ দিলেন দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে কোটির গুলি তৈরি করে দেওয়ার। শুধু তাই নয়, একবছর পরে রানী যেন করজোড়ে রাজদরবারে এসে জানান জীর্ণ কুটিরে নাশ করে জগতের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের রাজধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার এক সুন্দর চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

‘মূল্যপ্রাপ্তি’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ‘অবদানশতক’-এ প্রাপ্ত বৌদ্ধ কাহিনীর নির্যাসটুকু গ্রহণ করে রচনা করেছেন। এই কবিতায় সুদাস মালি তার কাননের সরোবরে প্রস্ফুটিত অকালের পদ্মফুলটি স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি না করে চলেছে প্রভু বুদ্ধের চরণে উৎসর্গ করতে। ভগবান বুদ্ধের শান্ত সমাহিত করুণাঘন মূর্তিটি খুবই অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি-

“বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,

নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।”

ভক্তির আলোকে ভক্ত ও ভগবানের নিগূঢ় সম্পর্কের রূপটি কবি এখানে অপার মহিমায় মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। সুদাস মালি চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি।

‘অভিসার’ কবিতাটি ‘বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা’ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতায় কবি সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ‘অভিসার’ কবিতায় এমন উপাখ্যানের বহু পরিবর্তন সাধন করেছেন ও বৈচিত্র্য এনেছেন। কবিতাটি কবে শুরু করেছেন-

“সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিল সুপ্ত-”

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ অবদানের উপগুপ্তের কাহিনি অবলম্বন করলেও কবির গভীর অনুভূতি, জীবনদর্শন এবং প্রেম ভাবনার প্রভাবে রূপান্তরিত হয় ‘অভিসার’ কবিতা তথা সন্ন্যাসী উপগুপ্তের চরিত্র সর্বতোভাবেই রবীন্দ্রসৃষ্ট এক অপূর্ব কাব্যকর্ম হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য মানব ও সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সাহিত্যের মাধ্যমে বিকশিত হয়। সাহিত্যে মানব মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং মানব জীবনের শাস্বত ও চিরন্তন অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাস এক অনন্য বিভাগ। প্রারম্ভকালে উপন্যাসের বিষয় ছিল কাহিনী প্রধান, পরবর্তীকালে উপন্যাসে চরিত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়। সম্প্রসারণশীল বিশ্বচেতনা মানুষকে একদিকে যেমন উদার ভাবাপন্ন করে তুলেছে, অপরদিকে তার জীবনে সৃষ্টি করেছে অপরিসীম দ্বন্দ্ব জটিলতা, আর উপন্যাসে পরে তারই প্রতিফলন।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উপন্যাস হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’^৬ একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসে হরপ্রসাদ বৌদ্ধদের অধঃপতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি হাজার বছর আগের প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত জনজীবনের সামাজিক ইতিবৃত্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের অবসান এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মূল এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনের চাষ-আবাদ, কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলাচর্চা, স্থাপত্যকলা, বিদ্যাচর্চা সব মিলিয়ে দুটি ধর্মের সমাজ বিন্যাসের এক ব্যাপক প্রেক্ষাপট অঙ্কন করেছেন। বণিক বিহারী দত্তের মেয়ে মায়া কে নিয়ে উপন্যাসের আখ্যাপত্র হলেও এই কাহিনী সেই অর্থে কোন নায়ক-নায়িকার গল্প নয়। সাতগাঁ, প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের শহর ও গ্রাম-গ্রামান্তরে নিয়ে এক বৃহৎ ভূখণ্ডের জনজীবনের ইতিহাস এই গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। হরপ্রসাদ দেশের ইতিহাস বলতে বুঝতেন জনসমাজের ইতিহাস। সাতগাঁর বৌদ্ধ রাজা রূপা বাগদীর রাজত্ব লোপ এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ হরিবর্মার রাজা হওয়ার ঘটনার মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত থাকলেও রাজনৈতিক কৃতিত্ব বদল এই উপন্যাসে গৌন ব্যাপার। এই উপন্যাসের ভাষা শৈলীর দিকে লক্ষ্য করলে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মাবলম্বী সাহিত্য রচনার আদিম ভাবনা থেকেই বৌদ্ধ আখ্যান-উপাখ্যান গুলি সাহিত্যের সামগ্রি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের শান্ত সৌম্য ভাবমূর্তির জন্য। তাই বাংলা সাহিত্যেও তাঁর প্রভাব কম বেশি লক্ষ্য করা যায় নাটক, কবিতা ও উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে।

সূত্র নির্দেশ:

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন।

২. বুদ্ধদেব-চরিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
৩. অশোক, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
৪. বিদুরথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
৫. মুক্তির ডাক, মন্মথ রায়।
৬. বেনের মেয়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য।
২. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।
৩. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ডঃ আসিতকুমার বঙ্ক্যোপাধ্যায়।